আবরারের মৃত্যু এবং ছাত্র রাজনীতি

জিয়াউদ্দীন আহমেদ

| ঢাকা , রোববার, ২৭ অক্টোবর ২০১৯

প্রথম পর্ব

আবরার ফাহাদ বাংলাদেশ প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক প্রকৌশল বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিল। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক কিছু চুক্তির সমালোচনা করে ফেসবুকে পোস্ট দেয়ার কারণে তাকে বুয়েট ছাত্রলীগের কিছু নেতাকর্মী পিটিয়ে হত্যা করেছে। হত্যা করার পর বস্তাপচা যুক্তি, ‘ও শিবিরের কর্মী ছিল’ বলে খুন করাকে জায়েজ করার প্রয়াস নিয়েছিল। বোঝা যাচ্ছে শিবিরের কর্মী হলেই তাকে পেটানো যায়, পেটানো আইনসিদ্ধ। পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আবরারের পরিবারের প্রায় সবাই আওয়ামী লীগের সমর্থক। একটি রুমে তাকে ডেকে নিয়ে দফায় দফায় পেটানো হয়েছে সন্ধ্যারাত থেকে ভোররাত পর্যন্ত; আশেপাশে কেউ খোঁজ পায়নি, আবরারের চিৎকারের শব্দ কেউ শোনেনি- এটা অনেকটা অস্বাভাবিক। ছাত্রলীগের এই দুর্বৃত্তরা নিশ্চয়ই আবরারের মুখে কাপড় গুঁজে দেয়নি, কারণ ভিকটিমের চিৎকার শোনা না গেলে

মাস্তানেরা পাটিয়ে সুখ পায় না। সারারাত আবরার তার রুমে ফেরত না আসা সত্ত্বেও কেউ খোঁজ নেয়ার গরজ বোধ করল না। আসলে অনেকেই জানে, কিন্তু কেউ বাঁচানোর সাহস করেনি। কেন সাহস করেনি তা শুধু হলের নিরীহ ছাত্ররাই অনুধাবন করতে পারে, হলের বাইরের কেউ নয়। হলে যারা এমন বিপদের মুখে পড়েননি তাদের পক্ষে এর ভয়াবহতা কল্পনা করাও অসম্ভব। এই দুর্বৃত্তরা যখন প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে তখন চারিদিকে আতঙ্ক সৃষ্টি করে, প্রতিপক্ষ কাউকে সম্মুখে পেলেই নির্দয়ভাবে পেটাতে থাকে, রুমে রুমে গিয়ে গভীর রাতে সাধারণ ছাত্রদের ঘুম থেকে জাগিয়ে প্রতিপক্ষের খোঁজ করে। ১৯৭৭ সনে আমাদের সতীর্থ মর্তুজা মহসিন হলে এমন একটি পরিবেশে পড়ে ভয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে, মনোচিকিৎসক তাকে দৈনিক দুশতবার ‘আমি ভালো আছি’ এ বাক্যটি বলার পরামর্শ দিয়েছিল। একই অবস্থা বুয়েটসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব হলে বিরাজমান বলে আমার বিশ্বাস। আশেপাশের সবাই আবরারের চিৎকার নিশ্চয়ই শুনেছে, কিন্তু মরার ভয়ে কেউ ওদিকে যায়নি। পুলিশও ছাত্রলীগের কর্মীদের ঘাটাতে ভয় পায়। পুলিশও মাঝ রাতে এসেছিল শিবিরের কর্মী আবরারকে গ্রেফতার করতে, পুলিশকে ফোন করেছিল ছাত্রলীগের নেতারাই। ছাত্রলীগের নেতাদের মতের পরিবর্তন হয়, তারা পুলিশকে চলে যেতে বলে, পুলিশ সুবোধ বালকের মতো চলে আসে। তখনো যদি পুলিশ একটু মাথা

খেলাতো তাহলে আবরার হয়তো বেঁচে যেত। তাই আবরারের হত্যার জন্য হলো প্রশাসন ও পুলিশসহ হলের সব ছাত্র পরোক্ষভাবে দায়ী।

যারা আবরারকে মেরেছে তাদের প্রায় সবাই বুয়েট শাখা ছাত্রলীগের কার্যকরী কমিটির কোন না কোন পদে অধিষ্ঠিত; তাই এরা নেতা। কিন্তু এমন জ্ঞান-গরিমা নিয়ে এরা নেতা হলো কি করে? অথবা এরা বুয়েটে ভর্তি হওয়ার সুযোগই বা পেল কীভাবে? এত গোবরে ভরা ব্রেইন নিয়ে বুয়েটে চান্স পাওয়ার কথা নয়। নেতারা ইশারা, ইঙ্গিতে মারার নির্দেশ দিতে পারে, কিন্তু সরাসরি পেটানোর দায়িত্ব তো নেয়ার কথা নয়। ছাত্র রাজনীতি কোন পর্যায়ে নেমেছে তা এদের কর্মকাণ্ড দেখলে স্পষ্ট হয়। এ সব প্রকৌশলীরা ভবন তৈরি করলে ভবন ভেঙে যাবে, ব্রিজ বানালে আপনা-আপনি তা ধসে পড়বে। ধর্মের মতো এরা কিন্তু ভিন্নার্থে উগ্র দলপ্রীতির রোগে ভোগে। দুয়েকটি জীবনের বলি হওয়ার বিনিময়ে এদের কাছে দল বড়। তাই দলের বিরুদ্ধে কোন সমালোচনাই এরা সহ্য করতে পারে না। এমন কট্টর লোক সব দলেই আছে। ১৯৯৬ সনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বিএনপি সমর্থক আমার এক সহকর্মী তার বাসার টেলিভিশন কালো কাপড়ে ঢেকে দিয়ে বাসায় পরিবারের সদস্যদের বলে দিয়েছিলেন, ‘খবরদার, আওয়ামী লীগ যতদিন ক্ষমতায় থাকবে ততদিন টিভি খোলা যাবে না, এখন টিভিতে শুধু শেখ হাসিনাকে দেখানো হবে’। এখনও মাঠে-ঘাটে, হাটে-বাজারে সাধারণ

কর্মীদের মধ্যে দলীয় শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে অহরহ মারামারি হয়; অথচ বহু বছর আগে ডান-বাম তিন নেতার একত্রে গভীর রাতে বিনোদনের সময় পুলিশের নজরে এসেছিলেন, এদের একজনের ফাঁসি হয়েছে। বিভিন্ন দলের নেতারা সারাদিন একজন আরেকজনকে গালাগালি করে, গভীর রাতে এক হয়ে যায়; কিন্তু কর্মীদের মধ্যে এই সমঝোতা নেই। অন্যদিকে আমরা কর্মী ও সমর্থকেরা এতবেশী রাজনৈতিক সচেতন যে, দলীয় নেতা, নেত্রীর বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে সহ্য করতে পারি না, বিরোধী লোকটির মাথা ফাটিয়ে জেলে যেতে কসুর করি না। অথচ গণতান্ত্রিক বহু দেশের উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে বা যুবকেরা হয়তো তার দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামও জানে না, তারা গণতান্ত্রিক ভোট দেয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, রাজনীতি নিয়ে তারা নির্লিপ্ত, তারা উইক্যাণ্ড ব্যয় করে বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ উল্লাস করে, ওই আনন্দে থাকে না রাজনীতি, থাকে না ধর্মীয় আলোচনা। নাগরিকদের রাজনীতির প্রতি এমন নির্লিপ্ততা দেখে কোন কোন দেশ ভোট দেয়া বাধ্যতামূলক করেছে, ভোট না দিলে জরিমানা হয়।

রাজনীতির এ বীভৎস রূপ নতুন কিছু নয়। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বিচারে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসন ব্যবস্থা কম; ফলে ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন হলের খালি সিটগুলো বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে নিজের দলের ছাত্র, ছাত্রীদের মধ্যে বরাদ্দ দেয়ার ব্যবস্থা করে। তবে সত্তর দশকে সিট নিয়ে রাজনীতি এত

ব্যাপক ছিল না। আমি মানবিক বিভাগের ছাত্র হলেও ইমিডিয়েট বড় ভাই ড. মুনির উদ্দিন আহমেদের রুমে মেঝেতে থাকার সুবিধার্থে থাকতাম ফজলুল হক হলে; এ হলের প্রায় সবাই ছিল বিজ্ঞানের ছাত্র। তখনও মেধা ভিত্তিতে সিট বণ্টন হতো। আমাকে একটি সিঙ্গেল সিটের রুম বরাদ্দ দেয়া হলেও আমি তা অবহিত হই প্রায় একমাস পর মৃত্তিকা বিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রের কাছে। জাহাঙ্গীর নামে আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধুটি এসে বললো, 'দোস্ত, তোর নামে বরাদ্দ দেয়া সিঙ্গেল সিটেড রুমটি তুই না উঠলে আমার জন্য আবেদন করতে পারি, প্রায় এক মাস যাবত খালি পড়ে আছে, তুই উঠছিস না'। এখন মেধার ভিত্তিতে বরাদ্দ হয় কী না জানি না, হলেও এভাবে ছাত্র নেতাদের অগোচরে নিশ্চয় এক মাস খালি থাকে না। দলীয় মিছিলে অংশগ্রহণের শর্তে ফুটপাতে ব্যবসার মতো এখন নাকি টিভি রুম, কমনরুম দলীয় ছাত্র, ছাত্রীদের নেতারা বরাদ্দ দিয়ে থাকে। আশ্চর্য হচ্ছে, এগুলো হলো প্রশাসনের নজর এড়িয়ে যায়।

র‍্যাগিং নাকি এখন প্রতিটি হলের নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। নেতাকর্মীদের উঠতে-বসতে সালাম দিতে হয়- না দিলে বেয়াদপির জন্য শাস্তি পেতে হয়। সিগারেট আনতে, চা-বিস্কিট এনে খাওয়াতে নেতাকর্মীরা নাকি হরহামেশাই কনিষ্ঠদের নির্দেশ দিয়ে থাকে- না শুনলে খবর হয়ে যায়। এগুলোর জন্য শাস্তি খুব কঠিন নয়,- কান ধরে সবার সম্মুখে উঠবস করা, সামান্য দুচারটি চড়-থাপ্পড় খাওয়া, মাটিতে উপড় হয়ে খত দেয়া, নেংটা হয়ে

বারান্দা আতক্রম করা ইত্যাদ ইত্যাদ। সাধারণ ও নিরীহ ছাত্র, ছাত্রীরা ধরেই নিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে গেলে বড় ভাই ও নেতাদের চড়-থাপ্পড় খাওয়া জায়েজ। প্রতিদিন যেখানে এসব ঘটনা ঘটে সেসব ঘটনার ব্যাপারে নাকি হাউজ টিউটর ও প্রভোস্টেরা অবহিত নন, নেতাদের এসব অপকর্ম কেন তাদের অবহিত করা হয় না তা তারা জানতে চান মিডিয়ার কাছে। এই দুটি পদের লোকগুলো নিশ্চয়ই জানেন যে, অবহিত করা হলে নেতারা অবহিতকারীদের রিমান্ডে নিয়ে যাবে, হাউজ টিউটর প্রভোস্টেরা কিচ্ছু করতে পারবেন না। আশ্চর্য লাগে এ ভেবে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের লোকগুলো তাবেদারি কাজের জন্য দৈনিক পত্রিকা পড়ার সময়ও পান না। র‍্যাগিং নিয়ে প্রচুর পত্রিকায় লেখা হয়েছে। তাদের কেউ জানাতে হবে কেন? প্রশাসনে অবস্থান করে তারা কি বিভিন্ন অপরাধের খোঁজ নিতে পারেন না? না পারাটা অক্ষমতা নয়, অথর্বতা। আসলে এরা জেনেও না জানার ভান করছেন। নিজের গদি ও স্বার্থ রক্ষায় অনেক শিক্ষক, প্রশাসক ছাত্র নেতাদের তোষণ করে চলতে অভ্যস্ত, এরা ন্যায়-নীতি বিসর্জন দিয়ে পারলে দলীয় মিছিলে স্লোগান দিতে এক পায়ে দণ্ডায়মান। র‍্যাগিং করা শুরুতে বন্ধ করা গেলে ছাত্র নেতারা এত বেপরোয়া হয়ে উঠতে সাহস পেত না। র‍্যাগিং করে করে এরা বিনা বাধায় অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে- এদের কুকর্মের প্রতিরোধ আর প্রতিকার করার কোন শক্তি বা আইনকানুন না থাকায় এরা হাউজ টিউটর,

প্রভোস্ট ও ভিসিকে দলীয় লোক ভেবেছে। এমন তাবেদারি সংস্কৃতির প্রশ্রয়ে আবরারেরা আগেও মরেছে, এখনো মরছে, ভবিষ্যতেও মরবে।

মেরুদ-হীন ভিসি, প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরদের কারণে কিছু ছাত্রনেতা, কর্মীর দৌরাত্ম্য অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। ভিসি, প্রভোস্টদের নৈতিক স্খলনের কাহিনী এখন সবার মুখে মুখে। অধিকাংশ ভিসি, প্রভোস্ট দলীয় আশীর্বাদপুষ্ট থাকেন বলে নীতি বিরুদ্ধ দলীয় কর্মকাণ্ডে বাধা দেয়ার নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলেন। অবশ্য ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠনের বিরোধিতা করে টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ভিসি পদে টিকে থাকার এত লালসা কেন? ভিসি পদটি প্রশাসনিক ক্ষমতা জাহিরের পদ, পড়ালেখা বা গবেষণার জন্য এ পদের কোন গুরুত্ব নেই। কোন ভিসি নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বলে আমার জানা নেই, তবুও প্রশাসনে মেধা খাটানোর জন্য ভিসি পদে যাওয়ার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এত লালায়িত হয়ে পড়েন কেন? নিয়োগ পেয়েই এক ভিসি বিএনপির আমলে মধ্যরাতে ভিসির চেয়ারে বসতে ছুটে গিয়েছিলেন। এক ভিসি নাকি ভিসির পদ ছেড়ে দিয়ে যুবলীগের সভাপতি হতে ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন। বিএনপির আমলে ফারাক্কার ইস্যুটি জাতিসংঘে প্রস্তাবাকারে ‘উত্থাপনের’ জন্য চার বিশ্ববিদ্যালয়ের চার ভিসি খালেদা জিয়াকে অভিনন্দন জানাতে ছুটে গিয়েছিলেন। তখন আমার ভাই জনাব মহিউদ্দিন আহমদ তার একটি কলামে

লিখেছিলেন, ‘বক্তৃতায় কোন বিষয় প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা এবং প্রস্তাবাকারে উত্থাপনের মধ্যে পার্থক্য কোন ভিসি বোঝেন না- এমন ভাবতেই লজ্জা লাগে’। এক ভিসি সম্ভবত বিএনপি আমলে দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ব্যক্তিত্বহীন দলীয় রাজনীতি সাধারণ মানুষের কাছে দৃষ্টিকটু লেজুড়বৃত্তি হিসেবে প্রতিভাত হয়ে থাকে। এই কারণেই বুয়েটের ভিসি বুয়েটে আবরারের লাশ দেখতেও ভয় পান, গদি হারানোর ভয়ে দুই দিন পর লাশ দেখতে ছুটে যান আবরারের বাসায়।

বিদগ্ধজনেরা বলছেন, মাথা ব্যথার জন্য মাথা কাটা যাবে না, কিছু ছাত্র নেতার দুর্বৃত্তায়নের জন্য ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করা যথার্থ হবে না। বিদগ্ধজনদের ধারণা, ছাত্র রাজনীতির মাধ্যমেই জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব গড়ে উঠে, জাতীয় সংসদ ও সরকার পরিচালনায় যে নেতৃত্বের প্রয়োজন হয় তার প্রথম সবক ছাত্র জীবনে সঠিকভাবে অর্জন করা সম্ভব হয়। কিন্তু বাস্তব জীবনে এর প্রতিফলন দেখা যায় না। আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ ফোরাম জাতীয় সংসদে নির্বাচিত সাংসদের অধিকাংশই ব্যবসায়ী। এখন নির্বাচন টাকা নির্ভরভ নির্বাচনের জন্য টাকার প্রতিযোগিতায় সৎ, আদর্শবাদী ও নীতিনিষ্ঠ দলীয় নেতাকর্মীরা মনোনয়নই পায় না। এটা উপলব্ধি করার ক্ষমতা ছাত্র নেতাদের রয়েছে এবং রয়েছে বলেই ছাত্র নেতারা ছাত্র থাকাকালীনই টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করলে

আমাদের দেশের ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে উন্নত দেশের জগত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র রাজনীতির মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও স্টুডেন্ডস ইউনিয়ন রয়েছে, এই ইউনিয়নের নেতারা জাতীয় কোন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে না। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশের সরকার পরিচালনায় যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের অধিকাংশের ছাত্র জীবনে রাজনীতি করা বা নেতৃত্ব দেয়ার কোন নজির নেই। তাই জাতীয় পর্যায়ে নেতৃত্ব লাভে ছাত্র রাজনীতি অপরিহার্য নয়।

[লেখক : বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক নির্বাহী পরিচালক ও সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের সাবেক ব্যবস্থাপনা পরিচালক]

zeauddinahmed@gmail.com